Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৩৮তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০/ 24.05.2023

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
ভক্ত বৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রী প্রণব ঘোষ
ভারত আত্মা শ্রীচৈতন্য	ডাঃ রুহিদাস সাহা
পত্রে বিবেকানন্দ (আদর্শ নেতা)	শ্রী অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ
‘দেবতা’র খোঁজ	শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র
থিতিয়ে	শ্রী সুশীল কুমার মহান্তী
পরিবর্তনের খেলায়	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

DO NOT COPY

(১০.০৩.১৯২৬ - ২৪.১১.১৯৮৬)

প্রীতি কণা

"জীবনে দুঃখ কষ্ট থেকে ভয় পেও না। অন্ধকারের ভিতরেও মণি মাণিক্য থাকে। দুঃখ কষ্ট জীবনে অভিজ্ঞতা এনে দেয়, ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়তে সহায়তা করে। দুঃখ কষ্ট ও ব্যথায় তুমি ঋজু হও, দৃঢ় হও। সত্যের উপর ভিত্তি করে আরও সোজা হয়ে দাঁড়াও। তোমার পুরুষাকারকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের কৃপা লাভ কর।"

DO NOT COPY

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

মনে হচ্ছে অনেকদিন কলম ধরিনা। শরীরের উপর দিয়ে বেশ ধকল গেল। গত সাড়ে তিন বছর তো কম যন্ত্রণা ভোগ করিনি। একটার উপর আরেকটা বিপদ, আরেক সমস্যা - এতো লেগেই আছে। এবার গরমের ছুটিটা আমার মোটামুটি বিশ্রামেই কেটেছে। ছুটি আমাদের সম্পূর্ণ মাস ধরে থাকে না। বিএ, বিএসসি পরীক্ষার ইনভিজিলেশন ডিউটি থাকে। তার ফাঁকে লক্ষ্ণৌ থেকে ঘুরে এলাম। কারণ আর কিছু নয়। বিশ্রামের দরকার ছিলো।

বেশ কিছুদিন ধরে শরীরটা একেবারেই চলছিল না। বলবো আর কাকে? দুটি মাত্র প্রাণী বাস করি এই প্রায় এগারোশো বর্গফিট এলাকাতে। মামলা-মোকর্দ্দমার খরচ ইত্যাদির টেনশন তো আছেই। মোটামুটি আমার পুত্র ও অনু এই দুজন আমার টেনশন এত বাড়িয়েছিলো যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। আমার মত হার্টলেশ লেডি-ও বুঝতে পারলো হার্ট-এর ব্যামোটা কি কষ্টকর! চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেলো শ্রীপ্রীতিকুমারের সেই শেষের দিনের যন্ত্রণার পরিণাম। খুব শীঘ্র সামলে নিলাম কারণ এখনও সময় হয়নি বিহঙ্গের। --- আমার যাবার দেরী আছে। আমি অনেক কিছু দেখে যাব। একটা লাভ হয়েছে। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে আগে যা চিন্তা করছিলাম এখন আর তা করছি না। আমার সন্তান শ্রীপ্রীতিকুমারের অতি আদরের সন্তান। তার মনোবেদনার কারণ আমি হব না, এবং আমার যা আছে সব তার -- এই সিদ্ধান্তে এসেছি। তার সন্তানদের যা দেবার, সে দেবে কি দেবে না সেটা তার ব্যাপার; আমার এক্তিয়ারভূক্ত নয় ব্যাপারটা। সেটা চিন্তা করে শান্তিও পেয়েছি। অনুর ব্যাপারটা মাথা থেকে বের করে দিয়েছি। ওটাও আমার অধিকারের বাইরে। কেউ কোন ব্যাপারে যদি শুধু শ্রীপ্রীতিকুমারের "গুরুত্বের" উপর নির্ভরশীল হয়, স্ত্রী হিসাবে আমারও "হয়তো" কোথাও দায়িত্ব থেকে যায়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে তাঁর বা তাদের মত পথ, এমনকি "গুরুত্বও" অন্যত্র সমর্পিত, সেক্ষেত্রে আমার মাথাব্যথা থাকাটাই তো অকারণ।

অবশ্য আমি সবসময়েই চাই - চাইবো অনু ভালো থাকুক। কারণ সে আমার পুত্রস্থানীয়।

লক্ষ্ণৌটা আমাকে চুম্বকের মত টানে। শ্রীপ্রীতিকুমারের সেই ঘরটা আজও ঠিক তেমনই আছে। সেই খাট, সেই আলনা, সেই টেবিল চেয়ার আজও তাঁর অস্তিত্ব জানায়। আমার ইচ্ছে করে লক্ষ্ণৌর পথে পথে আমি কেঁদে গড়াগড়ি খাই। দুঃখু দুঃখু ভাবটা আমি প্রকাশ করতে পারিনা। তাই যারা আমাকে খুব কাছের থেকে না জানে তারা আমাকে অ্যাসেস করতে পারে না। ঐ হিন্দীভাষী ব্রাহ্মণ পরিবারের সাথে আমার যে কি আন্তরিক বন্ধন গড়ে উঠেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, কারণ শ্রীপ্রীতিকুমার ওদের খুব ভালবাসতেন। নিজের জামাকাপড় প্যাকেটে ভরে পুষ্পাদিকে দিয়ে বলেছিলেন, "আমি আবার আসবো লক্ষ্ণৌ।" পুষ্পাদির দৃঢ় ধারণা মাসীমা লক্ষ্ণৌ গেলেই পণ্ডিতজী লক্ষ্ণৌ থাকেন। তাই আমাকে বারবার ডাকেন তার কাছে। আমিও ফাঁক পেলে চলে যাই।

এবার লক্ষ্ণৌ ঁকালীবাড়ী দেখলাম। কি আফশোষ হচ্ছিল বলবার নয়। শ্রীপ্রীতিকুমার কালীমন্দিরে যেতে ভীষণ ভালোবাসতেন। অথচ তাঁর সাথে ঐ মন্দিরে আমি গত ছয় সাত বছরে কখনো যাইনি। তাঁকে কেউ বলেইনি ওখানে অত সুন্দর বৈচিত্র্যময় ঁকালীমূর্তি আছে। এবার আমার বড় বেশী করে মনে পড়ছিলো তাঁর কথা। লালবাগ, ষ্টেশন রোড, হজরতগঞ্জ, কেশরবাগ, আমিনাবাদ হেঁটে চলে যেতেন। কত গল্প করতেন। কলকাতার বাড়ির শ্রীপ্রীতিকুমার ও বাইরে বেড়াতে যাওয়া শ্রীপ্রীতিকুমারের আকাশ পাতাল তফাৎ। যাঁরা তাঁর সঙ্গে বাইরে না গেছেন তারা ধারণাও করতে পারবেন না এমন একটি রাশভারী ব্যক্তির অন্তর অত স্নেহ মমতা, কৌতুক রসে ভরা। ঢালাও খাওয়াবার ব্যবস্থা, ঢালাও বেড়াবার ব্যবস্থা। কি আগ্রহ সহকারে বলতেন, "কিছু কিনে নাও তোমার জন্য।" উড়িষ্যা ছাড়া অন্য কোথাও শাড়ী কেনবার আগ্রহ আমার নেই, ছিলোও না। আমি কিনতাম হাউস কোট, কার্ডিগান, ব্ল্যাঙ্কেট ইত্যাদি। কিন্তু অন্যের জন্য অনেক কিছু আমার কেনা

হতো না। ওঁর খুব প্রিয়জনের জন্য দুএকটা জামাকাপড় কেনা হত। আমি সঙ্গে না গেলেও পুরী গেলে খুব সুন্দর সুন্দর শাড়ী কিনে আনতেন। বাপীর জন্যও শার্টের কাপড় আনা চাইই। আমাকে শেষবার হঠাৎ একটি বাপ্তা শাড়ী এনে দিয়েছিলেন। সেবার ঐ শাড়ী কিশোরের বউকেও একটি দিয়েছিলেন।

শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে ভালো শাড়ী কিনে দিলে, বা কিছু জিনিষ দিলে অনেকের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়তো। এবং কখনও কখনও সেটা খুব প্রকট হত। একজন সাধক আবার তাঁর স্ত্রী পুত্রকে কিছু দেবেন কেনো? অর্থটা প্রায় সে রকম দাঁড়াতো। আমার উপহারটা খুব পছন্দের হলে কানে কানে মিষ্টি করে হেসে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নাম করে বলতেন, "ওর সামনে বের কোর না, তাকে বোল না - ইত্যাদি ইত্যাদি।" কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে খুব খুঁতখুঁতে ছিলেন। সকলকে সব কিছু জানতে দিতে চাইতেন না।

যদি বাইরে যাওয়া ঠিক হতো হঠাৎ চলে যেতেন। জানতে পারলে ভক্তবৃন্দ পাগলের মত ছুটে আসতো বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজনেরা অত্যন্ত নীচের মত বিভিন্ন কামনা-বাসনা-প্রার্থনা ব্যক্ত করত, যেটা হয়ত তিনি ফিরে আসলেও করা যেত। কিন্তু তাদের তর সইত না। এই ধরণের দু-একজন অবশ্য শ্রীপ্রীতিকুমারের প্রয়াণে থেমে থাকেন নি, অন্য কামধেনুর সন্ধান করেছেন। আমি কখনও শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে কিছু পাই নি। বলতেন, "নিজের স্ত্রী পুত্রের জন্য আমি কিছু করতে পারবো না।" এখন কিন্তু আমি যদি সত্যি তাঁর কাছে কিছু চাই তাহলে পেয়ে যাই। কিন্তু আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এই যখন তখন কিছু প্রার্থনা করে আমি ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেব না। আমার ভোগটাও তো আমাকে করতে হবে।

আমি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বড় মহারাজ স্বামী সচ্চিদানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছি শ্রীপ্রীতিকুমার প্রয়াত হবার পর। শ্রীপ্রীতিকুমার আমার সাথে গুরুর মত আচরণ করেন নি, আমার তহবিল টাকায় ভরে দেন নি, আমাদের সন্তানকে আলাদা

DO NOT COPY

করে সুখের সাগরে ভাসিয়ে দেন নি, আমার কোনও সমস্যার সমাধান করতে চান নি, কিন্তু আমাকে সচ্চিদানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষা নেবার অনুমতি দিয়েছিলেন, স্বামী বিবিদিষানন্দজীর কাছেও তাঁর ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। সেইজন্য বড় স্বামীজী মহারাজের প্রয়াণের আগে আমি দীক্ষা নিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল তিনি প্রয়াত হলে শ্রীপ্রীতিকুমারের অভিলাষ আমি পূরণ করতে পারবো না। আমি আমার স্বামীর নির্দেশ পালন করতে চেয়েছিলাম। আমিতো রীতিমত তিরিশ বছর তাঁর সঙ্গে একই ছাদের তলায় বসবাস করেছি এবং রীতিমত ছাদনাতলায় সাতপাক ঘুরে তাঁর ঘরণী হতে হয়েছিল। তিনি অন্যদের যা দিয়েছিলেন আমি কখনও তার জন্য হা-হুতাশ করি নি। আমার গণ্ডীর বাইরে আমি যাবার চেষ্টা করিনি বলেই নিজেকে দৃঢ়চেতা করে গড়ে তুলতে পেরেছি।

আমার প্রতি তাঁর কৃপা অনুভব করি আজ। আগে চিন্তা করিনি। অনুতাপ অনুশোচনায় মানুষ তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে। আমি একটি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে। একজন মহাপুরুষের স্ত্রী হয়েও তাঁর পরিধি আন্দাজ করতে পারিনি। আজ সেজন্য বড় কষ্ট হয়। আমি জানি আমার এই অনুশোচনা অনেক বেশী করে তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করাবে এবং ভবিষ্যতে আমাকে অন্তর্মুখী করে তুলবে।

– – – – – – – – – – –
(** রচনাকাল - জুলাই, ১৯৯০)

DO NOT COPY

গোলাপ মা

গোলাপ সুন্দরী দেবী কন্যা চণ্ডীর অকাল মৃত্যুতে যখন শোকে পাগলের মতো, তখন যোগীন মা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসেন। ঠাকুর সেদিন বাল্যবন্ধু শ্রীরামের অকাল মৃত্যু এবং সেই জন্যে তাঁর শোকের কথা উল্লেখ করে ভক্তদের উপদেশ দিয়েছিলেন। উত্তরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোলাপ মা সেই উপদেশ শুনেছিলেন। মনে হয় শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর মনের অবস্থা বুঝেই অন্তর্যামী ঠাকুর সেদিন শ্রীরামের শোকের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। ঠাকুরের উপদেশ শুনে যে ব্রাহ্মণীর শোক কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই উপদেশামৃতই সব নয়। ঠাকুরের মানবিক ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। বাড়ী ফেরার জন্য ঠাকুরের অনুমতি প্রার্থনা করে ব্রাহ্মণী যখন বললেন, "তবে আমি আসি!" ঠাকুর এক কথায় রাজী হলেন না। সেদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি – বেলা তিনটে। ঐ রোদে অতটা পথ যেতে ব্রাহ্মণীর কষ্ট হবে মনে করে তিনি বললেন, "তুমি এখন যাবে? বড় দূর! কেন? এদের সঙ্গে গাড়ী করে যাবে।"

ঠাকুর একদিন এই ভক্ত ব্রাহ্মণীর বাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন। কথা ছিল ঠাকুর নন্দ বসুর বাড়ি হয়ে তাঁর বাড়িতে যাবেন। ঠাকুরের আসতে দেরী দেখে ব্রাহ্মণী ব্যস্ত হয়ে নন্দ বসুর বাড়িতে খোঁজ নিতে বেরিয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে ঠাকুর এসে উপস্থিত হয়েছেন। অল্পক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী বাড়ী ফিরে ঠাকুরকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। তিনি অধীর ভাবে বলতে থাকেন, "ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচি না গো! ...। ওগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল - সেপাই সান্ত্রী সঙ্গে করে, তখন যে এত আহ্লাদ হয়নি গো! ওগো, চণ্ডীর শোক একটুও আমার নাই। মনে করেছিলাম, তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন কল্লুম সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব, আর ওঁর সঙ্গে আলাপ করব না; যেখানে আসবেন, একবার যাব, অন্তর থেকে

দেখব, দেখে চলে আসব। যাই সকলকে বলি, আয়রে আমার সুখ দেখে যা ...।" ব্রাহ্মণীর এই আর্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে ঠাকুর কথামৃতকার শ্রীম'কে বলেছিলেন, "আহা! এদের কি আহ্লাদ!"

গোলাপ মা সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, "তুমি ওকে পেট ভরে খেতে দেবে – পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে।" অন্য সময় বলেছিলেন, "তুমি এই ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে যত্ন করো, এই বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবে।" গোলাপ সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।"

গোলাপ মা মাঝে মাঝে নহবতে মায়ের কাছে থাকতেন। একই সঙ্গে ঠাকুর ও মা উভয়ের স্নেহ ভালবাসা পেয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

একদিন গোলাপ মা মায়ের কাছ থেকে ঠাকুরের ভাতের থালা এনে ঠাকুরকে খেতে দেন। ঠাকুর যখন বসে খাচ্ছিলেন গোলাপ মা সামনে বসে দেখছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন ঠাকুর যখনই মুখে গ্রাস দিচ্ছেন, তখনই ভিতর থেকে কে যেন সাপের মতো ছোবল মেরে গিলে ফেলছে। এটা দেখে তিনি হাসতে লাগলেন। ঠাকুর তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিগো, বল দেখি, আমি খাচ্ছি না কে খাচ্ছে?" গোলাপ মা যা দেখেছেন তা বর্ণনা করলে ঠাকুর প্রশংসা করে বলেছিলেন, "ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। তুমি বলে দেখতে পেয়েছ, বুঝতে পেরেছ"। এই ঘটনাটি বর্ণনা করে গোলাপ মা পরে বলেছিলেন, "সর্পাকার কুণ্ডলিনীর আহুতি গ্রহণ বলে না? এ তাই দেখেছিলুম।"

অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর যখন শ্যামপুকুরে ছিলেন তখন গোলাপ মা ঠাকুরের সেবাকেই প্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময় কেউ তাঁর বিরুদ্ধে ঠাকুরের কাছে কিছু বললে তিনি স্বপ্নে তা জানতে পারতেন। গোলাপ মা বলেছিলেন, "কি আশ্চর্য্য! সেই সময় কেউ ঠাকুরের কাছে আমার নামে কোন কথা লাগালে স্বপ্নে

দেখতুম ঠাকুর সে সব আমাকে বলে দিচ্ছেন, 'ওগো, তোমার বিরুদ্ধে এই সব কথা বলেছে। তুমি বল অমুক তোমাকে খুব ভালবাসে, সেও এই সব বলেছে।' সমস্ত রাত্রি ঠাকুরকেই স্বপ্নে দেখতুম।"

ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর মাতৃসেবাই গোলাপ মার জীবনের মূল অবলম্বন হয়ে ওঠে। কামারপুকুরে মার দুঃখময় জীবনের সংবাদ শুনে তিনি ভক্তদের সাহায্যে মাকে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং তারপর অধিকাংশ সময় তাঁর সঙ্গে বাস করেন। ধীরে ধীরে গোলাপ মা মায়ের জীবনে অপরিহার্য্য হয়ে ওঠেন। মা বলতেন, "যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার।"

গৌরী মা

গৌরী মা সন্ন্যাসিনী ছিলেন। তিনি নানা দেশ, নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করে কলকাতায় এলে বলরাম বসু তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে অনুরোধ করেছিলেন। ইতিপূর্বে বলরামবাবু তাঁকে বৃন্দাবনে ঠাকুরের কথা বলেছিলেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নামে একজন ভক্ত ব্রাহ্মণ ও পুরীধামে তাঁকে ঠাকুরের বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন, "মাগো, দক্ষিণেশ্বরে দেখে এলুম এক অসাধারণ মানুষ – অপরূপ রূপ, জ্ঞানে ভরপুর, প্রেমে ঢলঢল, ঘন ঘন সমাধি।" তথাপি তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করবার জন্যে কোন উৎসাহ বোধ করেননি। বলরামবাবুর অনুরোধের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "জীবনে অনেক সাধু দর্শন হয়েছে, দাদা, নতুন কোন সাধু দর্শনের সাধ আমার নেই। তোমার সাধুর যদি ক্ষমতা থাকে, আমায় টেনে নিয়ে যান - তার আগে আমি যাচ্ছিনে।"

দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে বসে ঠাকুর নিশ্চয়ই এ কথা শুনে থাকবেন, কেননা অলৌকিক ভাবেই তিনি গৌরীমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। একদিন গৌরী মা দামোদরকে সিংহাসনে রাখতে গিয়ে দেখেন সেখানে মানুষের দুখানি জীবন্ত পা, অথচ দেহের অবশিষ্ট অংশ দেখা যাচ্ছে না। ভাবলেন হয়ত চোখের ভুল। তিনি

দামোদরকে তুলসী দিলেন কিন্তু তুলসী গিয়ে পড়ল ঐ চরণপদ্মে। গৌরী মা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তিন চার ঘণ্টা পরে যখন তাঁর জ্ঞান হল তখন তাঁর মনে কেউ যেন তাঁর হৃদয় সুতোয় বেঁধে টানছে। ভোরবেলায় দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্যে তিনি বার বাড়িতে এলে বলরামবাবু তাঁকে গাড়ি করে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান। বলরাম বাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও আরো দু এক ভক্ত মহিলা ছিলেন। তখন সবে সকাল হয়েছে। ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করে ভক্তরা দেখলেন ঠাকুর আপন মনে সুতো জড়াচ্ছেন এবং "যশোদা নাচাত গো মা বলে নীলমণি, সে'রূপ লুকালি কোথা, করাল বদনি শ্যামা?" গানটি গাইছেন। ভক্তরা ঘরে প্রবেশ করতেই সুতো জড়ানো শেষ হল। গৌরী মা সুতো জড়ানোর উপলব্ধি করলেন এবং ঠাকুরের চরণ যুগল দেখে বুঝতে পারলেন সিংহাসনে তিনি কার পাদপদ্ম দর্শন করেছিলেন। তারপর ঠাকুর যেন কিছুই জানেন না এইভাবে গৌরীমার পরিচয় নিলেন এবং বিদায়কালে তাঁকে আবার আসতে বললেন।

পরদিন সকালেই গৌরীমা আবার দক্ষিণেশ্বরে হাজির। তাঁকে দেখে ঠাকুর বললেন, "তোর কথাই ভাবছিলুম।" গৌরীমাও তাঁর জীবনের অনেক কাহিনী এবং সিংহাসনে ঠাকুরের পাদপদ্ম দর্শনের কথা বললেন। ঠাকুর গৌরী-মাকে নহবতে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, "ওগো ব্রহ্মময়ি, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে এই নাও একজন সঙ্গিনী এল।" এরপর গৌরী-মা পরম আত্মীয়ের মতো বেশ কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরেই থেকে গেলেন।

গৌরী-মা নিজের হাতে ঠাকুরের প্রিয় খাবার তৈরী করে খাওয়াতেন। নহবতে বসে উচ্চভাবের এমন সব গান গাইতেন যে ঠাকুরের সমাধি হয়ে যেত। গৌরী-মা ঠাকুরকে পূর্ণ অবতার ও শ্রীশ্রীমাকে স্বয়ং ভগবতী বলে জেনেছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, "শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য - এই দুইয়ে অভেদ।" মাঝে মাঝে গৌরী-মার ইচ্ছা হত রামকৃষ্ণ অবতারেও গৌরাঙ্গলীলা দর্শন করবেন।

DO NOT COPY

অন্তর্যামী ঠাকুর ভক্তের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে কার্পণ্য করতেন না। তাঁর দেহ অবলম্বনে গৌরাঙ্গ লীলা প্রকটিত হত। তখন গৌরী মার আনন্দের সীমা থাকত না।

ঠাকুর গৌরী মাকে বলেছিলেন, "এদেশের মায়েদের বড় দুঃখু – তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।" গৌরী মা চেয়েছিলেন কতকগুলো মেয়ে, যাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি মানুষ করে দেবেন। ঠাকুর তখন হাত নেড়ে বলেছিলেন, "না, গো না, এই শহরে বসে কাজ করতে হবে। সাধন ভজন ঢের হয়েছে – এবার এ জীবনটাকে মায়েদের সেবায় লাগা, ওদের বড় কষ্ট!" এ শুধু ঠাকুরের ইচ্ছা নয়, এই সঙ্গে তাঁর অমোঘ আশীর্বাদও ছিল। সেই আশীর্বাদের জোরে গৌরী-মা এই শহরের বুকে অনেক কাজ করেছিলেন। সারদেশ্বরী আশ্রম তাঁরই সৃষ্টি।

ঠাকুরের দেহত্যাগের সময় গৌরীমা কলকাতায় ছিলেন না, বৃন্দাবনে ছিলেন। তাঁকে ঠাকুরের লীলা সম্বরণের আসন্নতার খবর পাঠানো হয়েছিল। তিনি সে খবর সময় মতো পাননি। শেষ পর্যন্ত গৌরী মাকে না দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, এতকাল কাছে থেকে শেষটায় দেখতে পেলে না – আমার ভেতরটা যেন বিল্লীতে আঁচড়াচ্ছে।" পরে মা বৃন্দাবনে গিয়ে গৌরী মাকে খুঁজে বার করেন। ঠাকুর মাকে দর্শন দিয়ে বৈধব্য চিহ্ন ধারণ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং এই বিষয়ে গৌরী মার কাছ থেকে শাস্ত্রীয় যুক্তি শুনে নিতে বলেছিলেন। গৌরীমা শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে মাকে বলেছিলেন, "ঠাকুর নিত্য বর্তমান, আর তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী। তুমি সধবার বেশ পরিত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হবে।"

ভানু পিসী

ভানু পিসী ছিলেন জয়রামবাটী অঞ্চলের ভক্ত। আসল নাম মানগরবিনী। ঠাকুরই তাঁকে ভানু পিসী নাম দিয়েছিলেন।

ঠাকুরের প্রতি ভানু পিসীর প্রবল অনুরাগ ছিল। ঠাকুর জয়রামবাটী গেলে ভানু পিসী তাঁকে দেখবার জন্যে ছুটে ছুটে যেতেন। পাড়ার সব মেয়েরাই ঠাকুরের

কাছে এসে জড়ো হত। মেয়েদের দেখে ঠাকুর এমন সব কথা বলতেন যে সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ত, আবার অনেকে লজ্জায় পালাত। তখন ঠাকুর বলতেন, "দেখলে গা, আগড়াগুলো সব উড়ে গেল। এবার তোমরা বস, কথা হবে।"

ঠাকুর একদিন ভানু পিসীকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার নাম কি? ভানুপিসী উত্তর করলেন, 'মানগরবিনী'। তারপর সারদা মার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "এ তোমার কে হয়? কি বলে ডাকে?" উত্তরে ভানুপিসী বললেন, 'পিসী'। তখন ঠাকুর তাঁকে বলেন, "তবে আজ থেকে তোমার নাম হল ভানুপিসী।" এই বলে ঠাকুর গান ধরলেন, 'গরবিনী নাম ঘুচেছে।'

ঠাকুর জয়রামবাটী গেলে ভানু পিসী সুযোগ পেলেই ঠাকুরের কাছে ছুটে যেতেন। তখন তাঁর কম বয়স। তাছাড়া জয়রামবাটীর লোকেরা ঠাকুরকে খ্যাপা জামাই বলত। তাই ভানুপিসীর বড় ভাই গৌরদাদা ভানুপিসীকে ঠাকুরের কাছে যেতে নিষেধ করতেন। নিষেধ অমান্য করে ঠাকুরের কাছে গিয়েও তিনি ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতেন। ঠাকুরও কখন কখন 'ঐ গৌরদাদা এলো' বলে ভয় দেখাতেন। তাঁকে ভীতত্রস্ত দেখে ঠাকুর বলতেন, "লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।" ঠাকুরের কাছে আসেন বলে ভানু পিসীকে গঞ্জনা সহ্য করতে হয় জেনে ঠাকুর বলেছিলেন, "যখন গৌরদাদা তোকে শাসাতে আসবে তখন তুই দুহাত তুলে হাততালি দিয়ে নাচবি আর বলবি, ভজ মন গৌর নিতাই। তাহলে তোকে পাগল মনে করে সে কিছু বলবে না।"

ঠাকুর জয়রামবাটী গেলে গানে, রঙ্গরসে আনন্দের হাট বসিয়ে দিতেন। একবার একজন ভক্ত মহিলা তাঁর গলায় একগাছা ফুলের মালা পরিয়ে দিলে ঠাকুর 'যশোদা নাচতে তোরে বলে নীলমণি' গানটি গাইতে গাইতে গভীর সমাধিতে ডুবে যান। চোদ্দ ঘন্টার মধ্যে সে সমাধি ভাঙ্গেনি। বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে যায়। এই ঘটনার পর কাউকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হত না। এদিকে ঠাকুরকে দেখতে না

পেয়ে ভানুপিসীর বড় কষ্ট হত। তিনি সারাদিন ঘরে বসে বসে কাঁদতেন, আর ভাবতেন ঠাকুরকে একটা পান খাওয়াতে পারলেও সারা জীবনের আকাঙ্ক্ষা খানিকটা তৃপ্ত হত। এই আকাঙ্খার কথা অন্তর্যামী ঠাকুরের জানতে বিলম্ব হয়নি। বিকালে বেড়াতে বেরিয়ে ভানু পিসীকে পেয়ে বললেন, "একটা পান দেবে?" পিসী কয়েকটা পান সেজে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দেখেন, ঠাকুর তালপুকুরের ধারে আপন মনে পায়চারী করছেন। হঠাৎ পিসীর দিকে দৃষ্টি পড়তে তিনি বললেন, "পান এনেছ? বেশ আজ থেকে আমাকে পান খাওয়াবে।"

একবার কামারপুকুর যাবার সময় ঠাকুর ভানু পিসীকে বলেছিলেন, "ওরে তুই খিলি তৈরী করে খাওয়াতে পারিস?" পিসী তক্ষুনি পান সাজতে ছুটে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন ঠাকুর অনেকদূর চলে গেছেন। পিসী পিছন পিছন ছুটতে লাগলেন। মেয়ে মানুষ তাই সাহস করে ডাকতে পারলেন না। দুই একখানা গ্রাম ছাড়িয়ে যাওয়ার পর ঠাকুর পিছন ফিরে দাঁড়ালেন, এবং পিসীকে দেখতে পেয়ে বললেন, "ওরে তুই এতদূর এসেছিস?" পিসী বললেন, "আপনি পান খেতে চাইলেন, তাই নিয়ে এসেছি।" ঠাকুর খুব খুশী হয়ে বলেছিলেন, "তোর হবে, তোর হবে।" তারপর পান হাতে করে বললেন, "মেয়ে মানুষ হয়ে এতদূর এলি, এখন বাড়ি গেলে যে তোকে ঠেঙ্গাবে। তুই এক কাজ করিস, কুমোর বাড়ি থেকে একটা হাঁড়ি হাতে করে নিয়ে বাড়ি যাস। তাহলে তারা মনে করবে যে তুই কুমোরবাড়ি গিয়েছিলি।"

"মহামায়া দ্বার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা। দেখ না, কাছে ভগবান আছেন, তবু তাঁকে জানবার জো নেই, মাঝে মহামায়া আছেন বলে।"

- শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ ভারত-পর্য্যটনে পাণ্ডুরপুরও গিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রচার পদ্ধতিও ছিল ঠিক এমনই। তিনি চলেছেন তো চলেছেন। চলার পথে কত মানুষ যে তাঁর করুণা লাভ করেছে তার পরিসংখ্যান নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষের হিসাব রাখা সম্ভবও নয়। তাই অনেক ঘটনা তাঁর জীবন চরিতে প্রকাশ পায়নি। তাঁর সৌম্যমূর্ত্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকর্ষণ করেছে। তাঁর প্রেমাশ্রু আর ভাবৈশ্বর্য্যে অসংখ্য মানুষ তাঁর ধর্মে আকৃষ্ট হয়েছে। নরহরি সরকার ঠাকুরের ভাষায় বলা যায়, নয়নের প্রেমাশ্রু-ধারায় তিনি সকলের চরিত্র শোধন করেছেন এবং তাদের আসুরী ভাব দূর করেছেন। প্রবোধানন্দ সরস্বতীও তাঁর রচিত 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত' গ্রন্থে তাঁর প্রচার প্রণালীর বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সাথী কৃষ্ণদাসই 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এই কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে প্রেম-ধর্ম প্রচারের প্রণালী সম্বন্ধে বলেছেন, প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে পথ চলেছেন, "লোক দেখি পথে কহে বল হরি হরি।। সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ। প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ।। কথো দূর বহি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বিদায় করেন তাতে শক্তি সঞ্চারিয়া।" প্রত্যক্ষদর্শীগণ এভাবেই তো তাঁর প্রচার প্রণালী বর্ণনা করেছেন। তিনিই তো কৃষ্ণ-রাম-হরি নাম করে চলেছেন। তাঁর নামই তো কৃষ্ণ চৈতন্য। তিনিই তো বলতেন কেশব-রাঘব। সুতরাং তুকারামের জীবন-ধারা মুহূর্তে যিনি পরিবর্তন করলেন, তাঁর মাথায় হাত রেখে যিনি আশীর্বাদ করে চলে গেলেন তিনি শ্রীচৈতন্য হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন ওঠে তুকারামের জীবনকাল নিয়ে। ঐতিহাসিকদের ধারণা তুকারামের জন্ম ১৫৮৮ সালে, মৃত্যু ১৬৫৯ সালে। আর, শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ১৫১২ সালে। তা হলে শ্রীচৈতন্যের তুলনায় তুকারাম পরবর্তীকালের। সুতরাং শ্রীচৈতন্য দর্শন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আবার অনেকের মতে, তুকারাম শ্রীচৈতন্যের

সমসাময়িক, তা হলে শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভ অসম্ভব হয় না। তুকারামের জীবনকাল যথার্থই যদি ১৫৯৮-১৬৪৯ হয় তাহলেও মনে করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, শ্রীচৈতন্যের কোন ভক্তের কৃপা তুকারাম লাভ করেছিলেন। তুকারামের যে প্রভু নিজেকে 'বাবাজী' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্য-ভক্ত, কারণ শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী কালে কেবলমাত্র তাঁর ভক্তদের নামের শেষে 'বাবাজী' শব্দ ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন ১৫৫৬ সালে, আর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৬০৫ সালে। অনেকের ধারণা 'সাহ আকবর' ভণিতাযুক্ত ব্রজবুলিতে লেখা পদটির রচয়িতা সম্রাট আকবর স্বয়ং। পদটি এই - "জিউ জিউ মেরে মন চোরা গোরা। আপহি নাচত আপন রসে ভোরা।। খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া।। পদ দুই চারি চলু নট নট নটিয়া। থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া।। ঐছন পঙ্গুকে যাও বলিহারি। সাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী।" সম্রাট আকবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট তখন দিল্লীর পাশে বৃন্দাবনে নতুন সূর্য্য মধ্য গগনে উদ্ভাসিত। এর সুচনা হয়েছিল লোদি বংশ-বাবর-হুমায়ুনের রাজত্বকালে। শ্রীচৈতন্যের নির্দ্দেশে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও শাস্ত্রাদি রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন শ্রীরূপ-সনাতন সহ গোস্বামীগণ। এই নিঃস্বার্থ জ্যোতির্মন্ডিত গোস্বামীদের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছেন অনেকে। তাঁদের মহিমা কীর্ত্তিত হয়েছে ভারতের আকাশে বাতাসে। এই পরিবেশে সম্রাট আকবরের পক্ষে এই ভাবে সেই সময়ে সেই মহিমার কীর্ত্তন অসম্ভব না হওয়াই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক এই কারণে যে, নবাব হুসেন শাহ ও তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ কবিশেখর ও বিদ্যাপতির নামে ব্রজবুলিতে কিছু পদ রচনা করেছিলেন। এরূপ একটা ধারার প্রচলন তখন ছিল। তাছাড়া সম্রাট আকবরের মধ্যেও এরূপ একটি মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। আকবর তাঁর সভাগায়ক তানসেনকে সঙ্গে নিয়ে রূপ-সনাতন, গোপাল ভট্ট, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি গোস্বামী দর্শনে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। তানসেন হরিদাস স্বামীর সঙ্গীত শিষ্য, আবার কৃষ্ণদাস গোস্বামী হরিদাস স্বামীর সঙ্গীত-গুরু। সেকারণেই আকবর সঙ্গে

করে নিয়ে এসেছেন তানসেনকে। সেখানে গিয়ে আকবর যা দেখলেন তাতে তিনি মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। শ্রদ্ধা জানালেন, অর্থ সাহায্য করতে চাইলেন। প্রত্যাখ্যান করলেন গোস্বামীগণ। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরও গোস্বামী দর্শনে গিয়েছিলেন পিতার মৃত্যুর পর। তাঁর ধর্মীয় গোঁড়ামী ছিল প্রকট। তবুও তিনি গোস্বামী দর্শনে গিয়েছিলেন, দর্শন করে বিস্মিত হয়েছিলেন আর সে কথাই লিখে রেখেছেন আত্মজীবনীতে। তিনি লিখেছেন - গোস্বামীকে যেরূপ দেখলাম তাতে মনে হল তিনি যথার্থই ভগবদ্ভক্ত, তিনি অন্তর্যামী আর সে কারণেই তাঁদের ধনের অভাব নেই।

বৃন্দাবনের কর্মযজ্ঞ ও সেই কর্মযজ্ঞের হোতা গোস্বামীদের দর্শন অভিলাষে মানুষ একদিন পাগল হয়েছিল। সাধারণ-অসাধারণ অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এসেছিলেন অনেকেই। এসেছিলেন আকবরের সেনাপতি মানসিংহ। এই সেই মানসিংহ যিনি বঙ্গদেশ থেকে কাবুল পর্যন্ত মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন, হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপ সিংহকে পরাভূত করেছিলেন, যশোহর অধিপতি প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করেছিলেন। এই মান সিংহই শ্রীচৈতন্যের একনিষ্ঠ ভক্ত রঘুনাথ ভট্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, গুরুর আদেশে তিনি বৃন্দাবনে বিখ্যাত গোবিন্দ মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

সম্রাট আকবরের সভা-গায়ক তানসেনের গুরু গোস্বামীদের শিষ্য। সম্রাট আকবর নিশ্চয়ই গোস্বামীদেরও অনুরোধ করেছিলেন তাঁর সভা অলংকৃত করতে। কারণ শাস্ত্র রচনার পাশাপাশি বৃন্দাবনে সুর সাধনাও হয়েছে। শ্রীজীব গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি সঙ্গীত সাধকের সঙ্গীত কৃতিত্বও অসামান্য। এঁদের কাছে শিক্ষা নিয়ে সঙ্গীতে পারদর্শী হয়েছিলেন ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ। সম্রাট আকবরের সে আবেদন প্রত্যা
খ্যাত হয়েছিল! প্রধান মন্ত্রিত্ব যারা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, তাঁদের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যান একেবারেই সাধারণ। কিন্তু অসাধারণ লেগেছিল সম্রাট আকবরের কাছে, বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি। এই বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে তিনি নিঃস্বার্থ ও উদার হৃদয়

গোস্বামীদের চারিত্রিক মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সম্রাট আকবরের মধ্যে যে ধর্মীয় উদারতা লক্ষ্য করা যায় তা যে সেই মহান গোস্বামীদের সংস্পর্শের ফলশ্রুতি তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

আগেই বলা হয়েছে সর্ব্ব ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতের আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে গৌর ভক্তগণ গৌর মহিমা সারা ভারতে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কৃতকার্য্যও হয়েছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত সামগ্রিক ভাবে লেখ্য ভাষা, আংশিকভাবে কথ্য ভাষা। তাই কথ্য ভাষা হিসাবে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন ব্রজবুলিকে। মৈথিলী, হিন্দি, রাজস্থানী, বাংলা, প্রাকৃত, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট ব্রজবুলি শ্রীচৈতন্যের সার্বভৌম ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে ব্যাপক বিকশিত হয়ে উঠেছিল। ব্রজবুলিতে পদ রচিত হতে সংস্কৃতের পাশাপাশি এই ব্রজবুলি হয়ে উঠলো ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শ্রীচৈতন্য ভক্তদের ভাব বিনিময়ের ভাষা, আর এভাবেই গড়ে উঠেছিল ভারতের ভাব-সংহতি। শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্বে ভাষা সমস্যা বলে কোন সমস্যাই আত্মপ্রকাশ করেনি তখন। শ্রীচৈতন্যপ্রেমের যাদু মন্ত্রে ভাষা সমস্যা দেখা দেয়নি। ফলে, গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-মিথিলা-মণিপুর-মথুরা-মাদ্রাজ-বৃন্দাবন-বারানসী-প্রয়াগ ছাড়িয়ে ভাষার ব্যাপ্তি বা সীমা বিস্তৃত হয়ে উঠেছে।

শ্রীচৈতন্যের ভারত পরিক্রমাকালে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিন্দুমাত্র ছিল না। পাণিপথের প্রান্তরে বাবর ইব্রাহিম লোদীর প্রচণ্ড যুদ্ধ, তারপর হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী লড়াইয়ে ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ঝড়-ঝঞ্ঝার ঘনঘটা। রাজধানীর এই অস্থিরতায় গৌড় বঙ্গও ছিল বিক্ষুব্ধ। ওদিকে বাংলার সুলতান হুসেন শাহ আর উড়িষ্যার স্বাধীন নৃপতি প্রতাপরুদ্র ছিলেন যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত। বাংলার হুসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যা রাজের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল ১৪৯৩-৯৪ সালে। সেই যুদ্ধ বন্ধ ছিল ১৫১২-১৫১৪ সাল পর্যন্ত। ১৫১৫ সালে হোসেন শাহ আবার উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন। রাজনৈতিক এই অস্থিরতায় সমাজ জীবন ছিল ভীত সন্ত্রস্ত, পঙ্কিলতার আবর্তে আবর্ত্তিত, সীমান্ত অঞ্চল ছিল ভয়াবহ। রাজা প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে

যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাননি বলে প্রধানমন্ত্রী সনাতন হুসেন শাহ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কারাগারে। এরূপ পরিস্থিতিতে বিপদের আশঙ্কার কথা ভেবে রাজা প্রতাপরুদ্র ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যকে নিষেধ করেছিলেন সেবারের মত বৃন্দাবন যাত্রা স্থগিত রাখতে। স্বাধীনচেতা পুরুষ শ্রীচৈতন্য সে নিষেধ শুনেননি। অগত্যা রাজা প্রতাপ রুদ্রাদি ভক্তগণ বঙ্গভূমিকে বাদ দিয়ে একটি নিরাপদ পথের রূপরেখা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও সম্মত হননি তিনি। জননী জন্মভূমি দর্শনে তিনি বঙ্গ দেশেও এসেছিলেন। রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও তিনি গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-বৃন্দাবন যাতায়াত করেছিলেন। উড়িষ্যা ও বাংলার মধ্যে যুদ্ধের সময়েই শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসের পর ১৫১০ সালে বঙ্গ থেকে নীলাচলে গিয়েছিলেন এবং সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে অর্থাৎ ১৫১৫ সালে নীলাচল থেকে বঙ্গদেশে এসেছিলেন। যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যেও সীমান্ত অতিক্রম করে যাতায়াতে ভয় তিনি পাননি। তাঁর চরিত্রে ভয় ভীতির স্থান ছিল না কোন দিন। তাঁর এই অসীম সাহসিকতার জন্যেই তিনি কখনও কোথাও বাধা পাননি বরং পেয়েছিলেন সহযোগিতা। আর সেই সহযোগিতা করতে চেয়ে সীমান্ত রক্ষী মুসলমানও তাঁর প্রেমের স্পর্শে তাঁর চরণে আত্ম নিবেদন করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে কৃষ্ণদাস গোস্বামী "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত"-তে লিখেছেন, 'বাহু তুলি হরি বলি প্রেম দৃষ্ট্যে চায়। করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়।।" শ্রীচৈতন্য জীবনের বহু ঘটনা প্রমাণ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই বর্ণনা কবির কল্পনা নয়, এ এক ঐতিহাসিক সত্য। বৃন্দাবন থেকে প্রয়াগ যাবার পথে শ্রীচৈতন্য একস্থানে ভাব সমাধি মগ্ন হয়ে চেতনা হারিয়ে ফেলেন। বঙ্গের ভক্তগণ তাঁকে ঘিরে বসেছিলেন। এমন সময় পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন পাঠান যুবক বিজলী খাঁ। বিজলী খাঁ রাজপুত্র, সঙ্গে চলেছিল তাই অনেক সৈন্য। এ ছাড়া সঙ্গে ছিলেন এক পীর। সকলেই অশ্বারোহী। অচৈতন্য অবস্থায় এক সন্ন্যাসীকে দেখে সসৈন্য বিজলী খাঁ অশ্ব থেকে নেমে এলেন। তাঁরা ভাবলেন, সঙ্গের লোকগুলিই সন্ন্যাসীকে অচৈতন্য করে তাঁর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেছে। সঙ্গের ভক্তগণকে সৈন্যগণ

সেই কারণে বন্দী করে ফেলল। অল্প সময় পরে শ্রীচৈতন্যের চেতনা ফিরে এলো, তার সমাধি ভঙ্গ হলো। তিনি এদিক ওদিক ফিরলেন, ভক্তদের খুঁজলেন, হরিনাম করলেন, প্রেমের দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকালেন। শ্রীচৈতন্যের সেই স্বর্গীয় দৃষ্টিতেই বিজলী খাঁ সহ সৈন্যদের মনে একটা পরিবর্তন এলো। সৈন্যরা ভক্তদের বন্ধন খুলে দিল। বিজলী খাঁ সহ সকলে ভাবলেন, এমন মনোহর দৃষ্টি তো তাঁরা এর আগে কখনও দেখেননি, এমন সৌম্য মূর্ত্তি সন্ন্যাসী তো পূর্ব্বে কোনদিন দৃষ্টি গোচর হয়নি। ক্রমে ক্রমে তাঁদের মন পরিবর্ত্তিত হতে হতে এমন পর্য্যায়ে এলো যে তাঁরা সকলেই শ্রীচৈতন্যের চরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন। এই পীরকেই তিনি নাম দিয়েছিলেন 'রামদাস'। বিজলী খাঁ সহ সকলেই তাঁর মানব ধর্ম গ্রহণ করলেন। ইতিহাসে এঁদেরই নাম হল পাঠান বৈষ্ণব।

উড়িষ্যায় মহানদীর পাশ দিয়ে যাত্রাকালে শ্রীচৈতন্য শবর স্কন্দ প্রভৃতি আদিবাসীদের দর্শন দিয়েছিলেন। তাদের ভিক্ষাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অথচ সমাজের দৃষ্টিতে এরা অস্পৃশ্য, এদেরকে মানুষ বলেই মনে করেনি কেউ কোনদিন। শ্রীচৈতন্যের প্রেম ঘন মূর্ত্তি ও অপার করুণায় সেই আদিবাসীগণ তাদের বিগলিত হৃদয়ে চিরস্থায়ীভাবে শ্রীচৈতন্যকে বসিয়ে অসীম আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের শুভাগমন, তাঁর করুণা প্রকাশের আনন্দঘন স্মৃতিকে স্মরণ করে চলেছে সেই আদিবাসীগণ। আর সেই স্মরণে তাদের বুক ভরে উঠছে গর্বে।

শ্রীচৈতন্য এক বিস্তৃত অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন দক্ষিণ ভারতে। যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই সহস্র সহস্র মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, অনেকে তাঁর চরণে নিবেদিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য যে পথে গিয়েছেন, যে সকল নগর গ্রাম অতিক্রম করেছেন সেখানেই রেখেছেন তাঁর পদার্পণের স্বাক্ষর। কালক্রমে তাঁর অনেক কিছু বিলুপ্তির অতলে চলে গিয়েছে, কিছু কিছু স্মৃতি বহন করে চলেছে। শ্রীচৈতন্য ইলোরার মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করেছিলেন। সেই ঘটনার স্মৃতিতে ইলোরার গহ্বরে অবস্থিত মন্দির গৌর নাম স্মরণ করে চলেছে, সেখানে গৌর পূজা চলে আসছে।

কুরুক্ষেত্রের কাছে থানেশ্বরী নামক গ্রামে জগন্নাথ পণ্ডিতের বংশধরদের মতে, জগন্নাথ পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করেছিলেন। তাঁরা আরো বলেন, জগন্নাথ প্রথম জীবনে ছিলেন বেদান্তের পণ্ডিত, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দর্শনে ও সান্নিধ্যে হয়ে গেলেন তাঁর অনুগত ভক্ত। শ্রীচৈতন্যের নির্দ্দেশেই তিনি বৃন্দাবন চলে যান এবং রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর আশ্রমে বসবাস করেন। সেই থেকে জগন্নাথ পণ্ডিতের বংশধরগণ শ্রীচৈতন্যের ভক্ত বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে গর্ব বোধ করছেন।

শ্রীচৈতন্যের পদার্পণের স্বাক্ষর রয়েছে বিহারেও। বিহারের ভাগলপুরে মনস্কামনানাথ নগরে পাদুকা নামে জৈনদের দুটি বহু পুরানো মন্দিরে শ্রীচৈতন্য কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন। ভাগলপুরে মন্দার পর্বত শীর্ষে অধিষ্ঠিত শ্রীমধুসূদনদেব দর্শনে এসে সেখানেও তিনি তিন দিন ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ চিহ্ন এখনও পর্বত পাদদেশে বর্ত্তমান রয়েছে।

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম ও বাণী ভারতময় ছড়িয়ে দিতে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তদের অবদানও সামান্য নয়। এই পবিত্র কার্য্যের একটি উল্লেখযোগ্য নাম কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী। বাড়ী তাঁর লাহোরে, জাতিতে তিনি পাঞ্জাবী। বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে কৃষ্ণদাসের সাক্ষাৎ হয়। সেই থেকেই তিনি শ্রীচৈতন্যের চরণে নিবেদিত প্রাণ। শ্রীচৈতন্য তাঁর এই একনিষ্ঠ ভক্তকে নিজের গুঞ্জমালা প্রদান করেছিলেন বলে এঁর নাম হয়েছিল গুঞ্জমালী। শ্রীচৈতন্যদেবের নির্দ্দেশে এই কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন মুলতান-পাঞ্জাব-সুরাট-সিন্ধুদেশ-গুজরাটে, সেখানকার মানুষ শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ সিংহাসনে বসিয়ে পুজো করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচারে গুঞ্জমালী প্রথমে গিয়েছিলেন মল্লার দেশে। সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বনোয়ারী চন্দ্রের হাতে তার দায়িত্ব অর্পণ করে গেলেন তিনি গুজরাটে। এখানে তিনি বড় গৌড়িয়াগাদি স্থাপন করে সেখানে শ্রীচৈতন্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গুজরাট থেকে গুঞ্জমালী পাঞ্জাবে গুলম্বাগ্রামে এসে সেখানে বহু শিষ্যের সঙ্গে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই বিগ্রহের সেবা পুজোর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে জনার্দ্দন নামক এক শিষ্যের হাতে। পরে জনার্দ্দন নিজের ছোটভাই শ্রীশ্যামজী গোঁসাঈকে মন্দিরের

মোহান্ত করেন। পাঞ্জাব থেকে গুঞ্জমালী গমন করেন সিন্ধুদেশে। সেখানে তিনি হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে বহু ব্যক্তিকে শ্রীচৈতন্যের ভক্তে রূপান্তরিত করেন।

অদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য শ্রীচক্রপানিকেও প্রেরণ করা হয়েছিল গুজরাটে চৈতন্য বাণী প্রচারে। গুজরাটে তিনি কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালীর সঙ্গে মিলিত হন, আচার্য্য গুজরাটে যে গাদি স্থাপন করেন তার নামই ছোট গৌড়িয়াগাদি।

উদীয়মান অধ্যাপকরূপে বর্ত্তমান বাংলাদেশ পরিভ্রমণে শ্রীচৈতন্য যে মানবীয় মহত্ব রেখে এসেছিলেন তার ফলেই পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য ধর্ম সেখানে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। এই মহান কার্য্যে শ্রীচৈতন্যের একনিষ্ঠ ভক্ত চৌষট্টি মোহান্তের অন্যতম মোহান্ত কবীন্দ্র বিষ্ণুদাস গোস্বামীর অবদান উল্লেখযোগ্য, শ্রীচৈতন্যের আদেশে তিনি ঢাকা জেলার সানোয়া গ্রামে গিয়ে বসবাস করেন এবং সেখান থেকেই মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে আত্মনিবেদন করেন। এই পরিবারের গোস্বামীগণ গাড়ো জাতির অনেক মানুষকে শ্রীচৈতন্যের ধর্মে দীক্ষিত করেন। এছাড়া, অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-গদাধর গোস্বামীর বংশধর গোস্বামীদের প্রচারও সংযোজিত হয়েছে এই মহান কার্য্যে।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণের অসীম আকর্ষণীয় শক্তির অপর দৃষ্টান্ত শ্রীনিবাস আচার্য্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' সহ গ্রন্থাদি শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন বৃন্দাবন থেকে বঙ্গদেশে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন বিষ্ণুপুরে বীর হাম্বীরের সাহায্যপুষ্ট লোকজন তা চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রীনিবাস আচার্য্যের সান্নিধ্যে এসে বীর হাম্বীর সেগুলো উদ্ধার করে সবিনয়ে ফিরিয়ে তো দিলেনই উপরন্ত তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী আসাম ও মণিপুরে মহাপ্রভুর বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। মণিপুরে পাহাড়িয়া জাতিদের মধ্যে তিনি মহাপ্রভুর ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বহু আদিম ও অনার্য জাতির মানুষ মহাপ্রভুর ধর্ম গ্রহণ করে নতুন জীবন লাভ করেছিল। ভক্তগণ মহাপ্রভুর বিভেদবিহীন সাম্য মন্ত্রে উদ্বোধিত হয়ে মানুষের মাঝে শ্রীচৈতন্যদেবের সাম্য বাণী প্রচার করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর ভক্তগণ মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখেছিলেন, তারা কে কোন জাতি বা বর্ণের সে প্রশ্ন দেখা দেয়নি কোনদিন, তাঁদের কাছে মানুষের পরিচয় মানুষরূপে।

শ্রীচৈতন্যের মুখ নিঃসৃত উপদেশ - "ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার। জন্ম সার্থক কর করি পর উপকার।।" এই বাণীতে শ্রীচৈতন্যের ভারত বোধের যে জ্বলন্ত আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে, এতে ভারতকে যে মহিমায় প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে তা সত্যই অতুলনীয়। ভারত সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি এই উক্তি। ভারতকে শ্রীচৈতন্য এই দৃষ্টিতেই দেখেছেন, আর দেখেছেন বলেই প্রায় পাঁচশ বছর আগে তিনি সাম্য প্রেম মৈত্রী ভিত্তিক উদার মানব ধর্মের যে প্লাবন এনেছিলেন, বঙ্গভূমিতে সীমাবদ্ধ করে না রেখে তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। আর, পৃথিবী যেমন তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে সব কিছুকে আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনই ভারতের সকল প্রান্তের মানুষ শ্রীচৈতন্যের অসীম শক্তির আকর্ষণে নিজেদের নিবেদন করেছিলেন তাঁর পাদপদ্মে।

শ্রীচৈতন্যের এই মহত্তম ভারত-বোধ শুধুমাত্র তাঁর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, শ্রীচৈতন্যের সান্নিধ্যে এসে তাঁর ভক্তগণও অসীম ভারত-বোধে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ এখানে ঠাকুর হরিদাসের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। নীলাচলে বসে ঠাকুর হরিদাস সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে আলোচনায় একবার বলেছিলেন, "ভারতভূমে জন্মি এই দেহ বৃথা গেল।" অর্থাৎ ভারতের মতো মহান দেশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি উপযুক্ত গৌর-ভক্ত হয়ে উঠতে পারলেন না, এই তাঁর আক্ষেপ, এই তাঁর বেদনা। যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ গৌর-ভক্ত। এই উক্তি তাঁর বিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এই উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর ভারত-বোধের যে প্রমাণ মেলে তার একমাত্র তুলনা শ্রীচৈতন্যের ভারত-বোধ, তাঁর অসীম ভারত-প্রেম। শ্রীচৈতন্য তাই যথার্থই ভারতাত্মা, - ভারতের প্রাণ পুরুষ তিনি।

পত্রে বিবেকানন্দ (আদর্শ নেতা) **শ্রী অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ**

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আদর্শ নেতা। তিনি কোন দেশের কোন নির্দিষ্ট নীতির নন। তবে তিনি সকল কালের জন্যে সকলের নেতা। এক কথায় বললে বলা চলে, তিনি হচ্ছেন সার্বজনীন নেতা। তাঁর নেতৃত্বের মূলে ছিল মানবপ্রেম। শিবজ্ঞানে জীবসেবা করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মহাজীবনের ব্রত। আর এই ব্রত যতখানি সাফল্যলাভ করেছে ততখানি তাঁর জীবনের মহিমা এবং বিরাটত্ব বেড়ে গেছে। আদর্শ নেতা মানেই সকলের জন্যে সমদুঃখী হয়ে সকলের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা দূর করা। এর জন্য চাই ত্যাগধর্ম। আদর্শ নেতা যিনি হবেন তাঁকে ত্যাগের ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে। যেমনটি হয়ে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষ। এ মানবজীবন আত্মভোগসুখের জন্যে নয়। পরের কল্যাণে এই মহামূল্যবান মানবজীবনকে সঙ্গে দেওয়ার কাজ হবে আদর্শ নেতার।

এক কথায় বললে বলা যায় আদর্শ নেতার জীবন হবে আদর্শ সন্ন্যাসীর মত। সন্ন্যাসী ও যোগীরাই সত্যিকার নেতা হবার যোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সেই রকম নেতা। প্রথম জীবনে তিনি যখন নিজের মুক্তির চিন্তায় দিনরাত বিভোর থাকতেন, নির্বিকল্প সমাধি লাভের জন্যে তাঁর মন সদাই উস্‌খুস্‌ করতো তখনি তাঁর গুরুদেব পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ নির্জনে থেকে বললেন, ছি নরেন! তুই নিজের মুক্তির চিন্তায় পাগল। এ কি করছিস! তুই হবি বটগাছ। সকলকে তোর ছায়ায় আশ্রয় দিবি।

সেদিন থেকে নরেনের চিন্তাভাবনা চলে গেল অন্যদিকে। তিনি তখন ভাবতে লাগলেন, প্রকৃত সুখ নিজের মুক্তিতে নেই, আছে সার্বজনীন মুক্তিতে অর্থাৎ সকলকে শিবজ্ঞানে সেবা করাই হছে মানব জীবনের সার্থকতা। দেবত্ব আসে চরম মানবত্বের মারফতে। আর এই মানবতার প্রকাশ হয় নররূপী নারায়ণের সেবায়।

এমন কি আদর্শ নেতাকে সময় বিশেষে নিজের সত্তা পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হবে। আমি নেতা, আমি ভি আই পি, আমার একটা মর্য্যাদা, স্ট্যাটাস বা প্রেস্টিজ আছে এই বোধ থাকলে চলবে না। এসব তুচ্ছ বস্তুজ্ঞানজনিত অহমিকা দূর করে আত্মভোলার ভাব নিয়ে বা নিজের বিদ্যা, মান, যশ গোপন করে নেতৃত্বের আসনে বসতে হবে সম্পূর্ণ সেবকের রূপ ধরে। জনগণের সেবা করতে হলে আদর্শ সেবক হতে হবে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজি জনৈক ভক্তকে পত্র মারফত লিখেছেন '...মা'র নিকট প্রার্থনা কর। নেতা হওয়া বড় কঠিন। সঙ্ঘের পায়ে যথাসর্বস্ব এমন কি নিজের সত্তা পর্য্যন্ত নেতাকে বিসর্জন করতে হয়।' ...(১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ২রা জুলাই তারিখে নিউইয়র্ক থেকে লেখা জনৈক ভক্তকে উদ্দেশ্য করে স্বামিজীর পত্র-পত্রাবলী-২য় খণ্ড-পত্র সংখ্যা ১৯৯-১৩৫ঢ় সংস্করণ)।

সেবক বা দাসানুদাস হয়ে জনগণের সেবা করতে হবে। অবশ্য এভাব একদিনে হয় না। বহুদিনের অভ্যাস চাই। তার ওপর চাই জন্ম সংস্কার। ঐজন্য নেতা আকাশ থেকে পড়ে না বা তৈরী করাও যায় না। নেতা যে হবে সে তার জন্মগত অধিকার নিয়ে আসবে। তাইতো দেখি আজকাল অনেকে টাকা, বিদ্যা ইত্যাদির জোরে নেতা হবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়। টাকা, বিদ্যা, রাজনৈতিক শ্লোগান বক্তৃতাবাজীর দরকার হয় না। দরকার হয় কতকগুলি চারিত্রিক গুণাবলী যা দিয়ে প্রকৃত নেতার মান নির্দ্ধারণ করা যায়। সেই গুণগুলি কি? দয়া, সহানুভূতি, ত্যাগ, সেবা ইত্যাদি। এদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বহু স্বার্থত্যাগী আদর্শ নেতার আবির্ভাব হয়েছিল। তাইতো আমরা স্বাধীনতা করায়ত্ত করতে পেরেছি অমন দুর্দ্ধর্ষ ও প্রতাপশালী বৃটিশ শাসকদের এদেশ থেকে চিরতরে হটিয়ে দিয়ে।

আর আজকাল আমাদের দেশে তেমন নেতা নেই। আদর্শ নেতা হওয়ার যেসব গুণের একান্ত অভাব ঘটেছে আধুনিক রাজনৈতিক নেতাদের জীবনে।

বর্তমানে নেতা নামধারী বহু লোক সমাজ জীবনে রয়েছেন। কিন্তু থাকলে কি হবে? তাঁদের জীবনে আত্মস্বার্থ, লোভ, মান যশের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি নীচ প্রবৃত্তিগুলি প্রকৃত নেতার আসন থেকে নামিয়ে দিচ্ছে। তাঁদের মনে নেই সেবকের বা দাসস্য দাস হওয়ার ভাব। তাইতো দেশময় আজ এমন সঙ্কটের তীব্রতর বিভীষিকা জনজীবনকে বিপর্যস্ত ও পঙ্গু করে তুলেছে। আজ যদি এদেশে প্রকৃত নেতা থাকতেন তাহলে ভারত সুন্দর, সুজলাসুফলা সোনার দেশে পরিণত হতে পারতো। বিশ্ববাসীদের কাছে তাঁর মানমর্যাদা বৃদ্ধি পেত।

কিন্তু তাতো দেখতে পাচ্ছি না। স্বামিজীর মনোমত নেতা আজ কোথায়? হ্যাঁ, ছিলেন বটে এককালে। তাঁর সময় এবং তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর আদর্শের ওপর ভিত্তি করে এদেশে বহু আদর্শ নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল। আমাদের সুভাষচন্দ্র ছিলেন স্বামিজীকথিত আদর্শ নেতার কনিষ্ঠতম সংস্করণ। তারপর আর কোথায় তেমন আদর্শবান মানুষ যিনি আদর্শ নেতার রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় থেকে দেশ ও দেশকে নিয়ে যাবেন গৌরব ও সমৃদ্ধির রাজ্যে? যিনি জীবনমৃত্যু, মান-যশ তুচ্ছজ্ঞান করে জনগণের সেবায় জীবনের সর্বস্ব দান করবেন?

আর একটি পত্রে স্বামিজী আদর্শ বা প্রকৃত নেতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন, '... দাদা, Leader (নেতা) কি বানাতে পারা যায়? Leader জন্মায়। বুঝতে পারলে কিনা ? লিডারি করা আবার বড় শক্ত - দাসস্য দাসঃ - হাজারো লোকের মন জোগানো। Jealousy-selfishness (ঈর্ষা, স্বার্থপরতা) থাকবে না - তবে Leader, প্রথম by birth (জন্মগত), দ্বিতীয় Unselfish (নিঃস্বার্থ), তবে Leader,.....'

স্বামীজি এই পত্রখানি লিখেছেন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চিকাগো থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে উদ্দেশ্য করে। পত্রখানি সংযোজিত হয়েছে পত্রাবলি গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ১০৫ নঃ পত্রে - ১৩৫৫ সংস্করণে।

আজকাল আমাদের সমাজ জীবনের সকল স্তরে নেতা হবার মোহ পেয়ে বসেছে। সেখানে কেবল রয়েছে ঈর্ষা ও স্বার্থের চিন্তা। দাসানুদাস হয়ে পরের সেবা করার পবিত্র অধিকার কেহ অর্জন করতে পারছেন না যা নাকি স্বামী বিবেকানন্দের কাছে পবিত্র আদর্শ ছিল।

এখনকার নেতারা স্বামিজী কথিত হাজারো লোকের মন জোগান না। তাঁরা ইলেকশানের সময় নিজেদের স্বার্থে ভোটদাতাদের কাছে আসেন কয়েকবার, তারপর ভোটের পর জয়লাভ করলে পাঁচ বছরের জন্যে জনজীবন থেকে দূরে সরে থাকেন ভি আই পি-র রূপে।

এই তো আমাদের দেশের বর্তমান নেতা ও নেতৃত্বের চেহারা। বর্তমান ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে যেরকম অশান্তি সুরু হয়েছে তা সত্যই দুঃখজনক। ওঁরা পথে বার হন পুলিশ পাহারায়, বাস করেন পুলিশ পাহারায়। যদি শহর থেকে জেলায় যান তো ওঠেন সার্কিট হাউসে, নয় ডাকবাংলোয়, থাকেন সশস্ত্র পুলিশ বেষ্টিত হয়ে। জনগণকে দর্শন দেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা পাকা থাকলে। ওঁরা কর্মীদের নিয়ে আলোচনা বৈঠকে বসার বা জনসভার ভাষণ দেবার ঝুঁকি নিতে চান না। ... ওঁদের জনসংযোগ প্রতি পাঁচ বছরে একবারই ঘটে, নির্বাচনের মুখে। নির্বাচিত হলেই ওঁরা উন্নীত হন নেতার স্তরে।

জনজীবনের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নেই তাঁরা জনগণের দুঃখকষ্ট দূর করবেন কিভাবে? আর জনগণের দুঃখ কষ্ট দূর না হলে দেশেরও উন্নতি হবে না। কারণ জনগণ নিয়েই দেশ। তাই দেশের উন্নতি করতে হলে জনসেবার ভার নিয়ে স্বামীজি কথিত বা স্বামীজির মত আদর্শ নেতার আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজন। সেদিন আমাদের দেশে কবে আসবে?

‘দেবতা’র খোঁজ **শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র**

এ বিশ্ব সংসারে মনুষ্য জন্ম অমূল্য। মানুষ তার জীবন-কালীন ব্যবহার, সৌজন্যবোধ ও শিক্ষা-দীক্ষার অসাধারণত্বে দেবতার আসন লাভ করতে পারে; আবার খারাপ ব্যবহার ও অসৎ চরিত্রের কালিমায় অসুরত্ব লাভ করতেও পারে। দেবতা মানুষ ও অসুর এক অঙ্গে অনেক রূপ। প্রত্যেকের জীবনযাত্রায় বিশেষ করে মনুষ্য জীবনে বেশ কয়েকটি অবগুণ মানুষকে নিম্নগামী করে তোলে - তখন তার ভূমিকা অসুর-সদৃশ হয়।

এক, কাম বা কামনা - এই অবগুণ-কারণে কোন পুরুষ বা স্ত্রী এত নীচে পৌঁছে যায়, যেখান থেকে তাকে উত্তোলন করা অসম্ভব।
দ্বিতীয়, লোভ - এর ফলে মানুষ অধোগামী হয়। তার বিচারশক্তি লোপ পায়।
তৃতীয়, ক্রোধ - এই রিপুশক্তির কারণে আগুনের মত নিজেই জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়।
চতুর্থ, মোহ - অর্থাৎ বিবেকহীনতা বা মায়া। অন্ধের মত বিবেকহীন হয়ে কোন কিছুকে আঁকড়ে ধরা।
পঞ্চম, মদ - অর্থাৎ দম্ভ বা অহংকার। এই অবগুণ সব কিছুকে অনায়াসে ধ্বংস করে দেয়।
ষষ্ঠ, মাৎসর্য্য বা পরশ্রীকাতরতা - অর্থাৎ অন্যের যা আছে আমাকেও তা আয়ত্ত্ব করতে হবে এরূপ মনোভাব। এর জন্য ছলনা, বঞ্চনা, খুন, মারামারি, হানাহানি কোনো কিছুতেই পিছপা হয় না।

এই ছয় ছয়টি অবগুণকে মানুষ যদি জয় করতে পারে, তাহলে তার মহত্ব বৃদ্ধি পায়। তখন সেই মানুষকে আমরা দেবতার আসনে বসাতে পারি। কিন্তু যারা এই সমস্ত রিপুকে জয় করতে পারে না, তারা ‘দানব’-এর পর্যায়ে পড়ে। তবে বেশ কিছু মানুষকে দেখা যায় যারা সবগুলি না হলেও কয়েকটি রিপু আয়ত্ত্বে আনার চেষ্টা

করে চলেছে। আমরা তাদের উন্নত মানুষের পর্যায়ে ফেলতে পারি। তারা দানব নয়। পৃথিবীতে অসাধারণ মানুষের সংখ্যা প্রায় শূন্য। সেকারণেই পরিসংখ্যানে 'দেবতা'কে অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যায় না। 'দেবতা' কোথায় থাকেন তার ঠিকানা জানা যায় না। `

থিতিয়ে **সুশীল কুমার মহান্তী**

ক্রমেই থিতিয়ে আসে
উচ্ছ্বাসের ঢেউ,
বাস্তব-এর রুক্ষভূমি
ভালবাসে কেউ?
স্বপ্নিল মেঘেরা সব
ছোটাছুটি করে
কেউ বরষার, কেউ
শুধু ছাতা ধরে।
কি আছে বিমূর্ত এই
সংসার ভিতরে?
কেউ আসে কেউ যায়
চলমান ঘরে।
সবই থিতিয়ে যায়
বেলা শেষ দিনে
তবুও উচ্ছ্বাস শুরু
নতুনের তানে।

DO NOT COPY

পরিবর্তনের খেলায়

সুনন্দন ঘোষ

স্বর্গ থেকে আগুন এনেছিলেন প্রমিথিয়াস।
অনন্ত জীবনের সূত্র এনেছিলেন নচিকেতা।
সময়ের জোয়ারে শ্রুতি থেকে বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেল
মহাজীবনের মন্ত্র ।
নচিকেতার মানুষ মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে ভুলে গেল।
প্রমিথিয়াসের আগুন ছড়িয়ে গেল সমাজ-তন্ত্রে।

খিদের আগুনে দেশ পুড়ছে,
অন্তর্দহনে পুড়ছে সমাজ।
হিরোশিমা, নাগাসাকি, হলোকাস্ট, কম্বোডিয়া .....
নানুর, মরিচঝাঁপি, বগটুই, খাদিকুল .....
নিয়োগ, কয়লা, গরু, সোনা .....

লেখনীতে যন্ত্রণারা বাসা বাঁধে।
বর্ণগুলো শব্দ হয়,
সেই শব্দ নিঃশব্দে রক্তাক্ত করে বিবেককে।

যুগে যুগে নিজেকে হারাই,
পরিবর্তনের খেলায় নিজেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য।

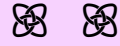

DO NOT COPY